International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-II, March 2017, Page No. 1-18
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

তত্ত্বে-শাস্ত্রে-মন্ত্রে-রূপে কালী : আদি থেকে অধুনা

ড.অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, নহাটা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

'Kali', the Goddess in hindoo mythology is entitled as the Goddess of Power or Supreme Energy. In fifteenth century the famous bengalee pandit named Krishnananda Agambagish transcripted his idea about the image & spirit of Goddess 'Kali' in his 'Tantrasar' book, has taken as a considerable and consented model of 'Kali' in entire Bengal. In great Indian legendary like 'Mahabharata', 'Haribansham', Upanishadas and other vedic literatures the description of Goddess 'Kali' has been admitted in various ways. 'Devi Kali' was also being imaged and prayed differently in 'Raghubansham' and 'Kumarsambhabam' written by Kalidasa as well as 'Kadambari' and 'Malatimadhaba' written by Banbhatta and Bhababhuti respectively. In the Primitive cult of our country, Goddess 'Kali' was being signified as a Non-Aryan odyssey. The Aryan invasion theory says that 'Asuras' were being worshiped outside of India mythologically and brought to India by the Indo-Aryans. Once the Aryans has started to worship 'Kali' as to get the power of destruction from 'Devi' against 'Asuras'. In the middle-age history of our country, 'Jayadratha-Yamal' book described 'Devi Kali' by the name of 'Ishan Kali', 'Raksha Kali', 'Birjya Kali', 'Pragya Kali' etc. In our country the rituality and doctrine of 'Shakto' is fully sovereign in respect to the other two like 'Shaiba' and 'Bhagabat'. 'Kali' or 'Kalika' is being keenly worshiped by bengalee in the name of 'Shyama' or 'Adyashakti Mahamaya' also. She is also reckoned as 'Dashamahavidya in 'Tantra'. In eighteenth & Nineteenth Century 'Devi Durga' and 'Devi Kali' was being vastly devoted as 'JagatJaanani' or 'Jaganmata' (The eternal mother of country) by Bankim Chandra Chottopadhyay, Ramakrishnadev, Vivekananda, Netaji Subhaschandra Bose and others. Even today the idea has been changed. Now we find and celebrate 'Dussehra' Festival as a day of lightning the prosperity and defeating the evils from our soul and society. Recently US President Barack Obama greeted Hindoos, Sikhs, Jains and Buddhists across the globe on the occasion of 'Diwali', saying 'The flame of the 'Diya', or lamp reminds us that light will ultimately triumph over darkness'.

তব রূপং মহাকালো জগৎসংসারকারকঃ । মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি ।।
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকাল প্রকীর্তিতঃ । মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পয়া ।।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেবামাদিরূপিণী । কালত্বাদাদিভূত ত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে ।।

[অর্থঃ জগৎ সংহারকারক মহাকাল তোমার একটি রূপমাত্র, এই মহাকাল মহাপ্রলয়ে সমুদয় পদার্থকে গ্রাস করিবেন। সর্ব্বভূতকে গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল,তুমি মহাকালকে গ্রাস করো বলিয়া তোমার নাম কালী,সকলের আদিকালত্ব,আদিভূতত্ব নিবন্ধন লোকে তোমাকে আদ্যাকালী বলিয়া থাকে।] (মহানির্বাণতন্ত্র-চতুর্থ উল্লাস এবং কালীতন্ত্র)

সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে (যদিও এই সময়কাল নিয়ে বিতর্ক আছে) বাঙালি পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে কালীধারণার যে রূপ ও প্রকৃতিকে লিপিবদ্ধ করেন সেটিই হলো সমগ্র বাংলাদেশে কালীদেবীর স্বীকৃত মডেল। এই দেবীই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের তন্ত্রসাধনা ও মাতৃপূজার আরাধ্যা দেবী হয়ে যান। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে, 'কালী' শব্দটি 'কাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ, যার অর্থ 'ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ' (পাণিনি ৪।১।৪২)। মহাভারত অনুসারে, এটি দুর্গার একটি রূপ (মহাভারত, ৪।১৯৫)। আবার হরিবংশ গ্রন্থে 'কালী' একটি দানবীর নাম (হরিবংশ, ১১।৫৫২)। 'কাল', যার অর্থ 'নির্ধারিত সময়', তা প্রসঙ্গক্রমে 'মৃত্যু' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মহাভারত-এ এক দেবীর উল্লেখ আছে যিনি হত যোদ্ধা ও পশুদের আত্মাকে বহন করেন। তাঁর নাম 'কালরাত্রি' বা 'কালী'। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক টমাস কবার্নের মতে, এই শব্দটি নাম হিসাবে ব্যবহার করা হতে পারে আবার 'কৃষ্ণবর্ণা' বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। তন্ত্রসারের বর্ণনা অনুযায়ী এই দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুন্ডমালাবিভূষিতা। দেবীর অধো বাম-হস্তে সদ্যচ্ছিন্ন শির ও উর্দ্ধহস্তে খড়্গ। অধো দক্ষিণহস্তে অভয় ও উর্দ্ধহস্তে বর। দেবী কান্তিময় রূপী মহামেঘের মতো শ্যামবর্ণা, তাই বাংলাদেশে এই দেবীর নাম 'কালী' নয়, 'শ্যামা'। ইনি দিগম্বরী, ঘোরদ্রংষ্টা, করালাস্যা, পীনোন্নতপয়োধরা, ঘোরনাদিনী, মহারৌদ্রী, শ্মশানগৃহবাসিনী। তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা, শিবাকূল দ্বারা চতুর্দিকে সমন্বিতা। তিনি মহাকালের সঙ্গে বিপরীতরতাতুরা, সুখপ্রসন্নবদনা ও স্মেরাননসরোরুহা। বৈদিক সাহিত্যে 'কালী' শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মুন্ডক উপনিষদের এই শ্লোকটিতে।

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ।।

এখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বা। কালীর মাতৃরূপ নিয়ে বৈদিক সাহিত্যে কোনও সন্দর্ভ নেই। পরবর্তীকালের পুরাণের মধ্যে মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে পাওয়া যায় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন রাত্রিকালে পান্ডব শিবিরে নিদ্রিত বীরদের হত্যা করছিলেন তখন এই বীরেরা রক্তাস্যনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা, ভয়ঙ্করী, সংহারিনী, কালরাত্রিরূপিনী কালী দেবীকে দর্শন করেছিলেন। কালীর এই উল্লেখ সম্ভবত পরবর্তী কালের বিক্ষিপ্ত সংযোজন। এই কালী ভয়াল সংহারের বিগ্রহ, কোনও প্রধানা দেবী নন। কালিদাসের রচনাতেও, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে, কালীর গৌণ উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু কালিদাসের নামকরণ দেখে মনে হয় সে সময় কৌম সমাজে কালী বা কালিকার স্বীকৃতি ছিলো। পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামে এক রক্তলোলুপা, ভয়ঙ্করী দেবীর উল্লেখ পাই, যিনি মদ্যমাংসপ্রিয়া, শবর, বর্বর, পুলিন্দগণ কর্তৃক পূজিতা হতেন (খিল হরিবংশ)। সপ্তম শতকে বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে এবং সমসময়ে ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে শবরদের নরমাংস বলিদানে পূজিতা রক্তলোলুপা চন্ডী বা করালী দেবীর কথা পড়া যায়। এই দেবী কৃষ্ণবর্ণা, উগ্রা, বনপ্রদেশ সমীপে শ্মশানে অধিষ্ঠান করেন। এই দেবী বস্তুত চামুন্ডা এবং পরবর্তীকালে ইনি কালী বা কালিকা দেবীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন। মূলস্রোতের আর্য লেখকদের রচনায় এই দেবীর প্রতি যে মনোভাব দেখা গেছে তাতে বোঝা যায় তিনি তখনও আর্যদেবীর সম্মান লাভ করেননি। মার্কন্ডেয় পুরাণের 'চন্ডী' অধ্যায়ে চামুন্ডা, কালী, কালিকা, কৌশিকী (ইনি গৌরী), অম্বিকা, পার্বতী সবার সমন্বয় করে এক করালবদনা কালীর রূপকল্প প্রস্তুত হলো। 'চন্ডী' শ্লোকানুযায়ী 'কালী' রূপের বর্ণনা হলোঃ

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নরক্তনয়না নাদ্যপূরিতদিঙ্মুখা।।

(চণ্ডী-৭/৭-৮)

এই কালী দেবী ঘোর যুদ্ধের পর চন্ড ও মুন্ডের শিরচ্ছেদ করে চন্ডিকাকে উপহার দিলেন এবং অট্টহাস্য করে বললেন চন্ডিকা নিজে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করবেন। এই কালীর রূপকল্পকে দেবী চন্ডিকা চামুন্ডা নাম দিলেন। পুরাণ, উপপুরাণ ও বিভিন্ন তন্ত্রাদিতে কালী বা কালিকার যে বিবর্তন ঘটেছে তা ব্যপক ও বিচিত্রমুখী। বস্তুত কালী প্রাথমিকরূপে শবারূঢ়া, শিবারূঢ়া নন। পরবর্তীকালে সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য শবরূপী শিব ও বলরূপিনী শক্তির কল্পনা করা হয়েছে। অধিকন্তু তন্ত্রের 'বিপরীত রতাতুরা' অর্থাৎ বিপরীত রমণে শক্তি দ্বারা নিষ্ক্রিয় পুরুষ শিবের পরাজয় প্রতিষ্ঠা করার তাগিদও যেন দেখা যায় এই কল্পনায়। তবে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে যখন তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত বিন্যাস হতে শুরু করে তখন কালীই অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে ব্রাহ্মণ পুরোহিততন্ত্রে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেন।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগে সংস্কৃত গ্রন্থ 'সদুক্তিকর্ণামৃত'তে ভাসোক নামে এক কবি কালীর বর্ণনায় লিখেছেন,'ক্ষুৎক্ষামহকান্ডচন্ডী চিরমবতুতরাং ভৈরবী কালরাত্রি।।' শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী যে নৈঋতি দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তীকালের কালী দেবীর সঙ্গেও তার বিশেষ মিল রয়েছে। শতপথ ও ঐতরেয়তে কালীকে কৃষ্ণা, ঘোরা ও পাশহস্তা বলা হয়েছে। এখানেই দেবী কালী অন্য সব আর্য দেবতাদের থেকে প্রকটভাবে পৃথক হয়ে যান তাঁর অনার্য রূপকল্পনায়। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয়ে বহু পার্থক্য থাকলেও ত্বকের বর্ণ অনুযায়ী তাঁরা সবাই ছিলেন মেঘবর্ণ। তাই তাঁদের কল্পিত দেবদেবীরাও তাঁদের নিজেদের মতো শ্যামলবর্ণ হবেন, এটাই স্বাভাবিক। ভারতের অসংখ্য অকুলীন বা অমুখ্য ইতরযানী দেবদেবীদের মতোই নীলাচলের অনার্য নিষাদজাতির আরাধ্য দেবতা জগন্নাথ এবং মূলতঃ বাংলা ও অসমের কৌমজনতার আরাধ্যা দেবী কালী তাঁর নানা অবতারে বিবিধ রূপে থাকলেও বর্ণবিচারে ঘোর কৃষ্ণই থেকে গিয়েছেন। এমনকি বেদের রাত্রিসূক্তকে কেন্দ্র করে যে রাত্রিদেবীর কল্পনা পরবর্তীকালে দেখা যায় তিনিও প্রকারান্তরে এই কালিকারূপিণী দেবীরই পূর্বসূরি।

ভারতীয় অনার্য জাতি প্রসঙ্গে আরো যে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটি উঠে আসে তা হলো প্রাচীন ভারতীয় হরপ্পা সভ্যতা। আনুমানিক পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হরপ্পা সভ্যতার উৎখননে প্রচুর পোড়ামাটির নারীমূর্তির সন্ধান মেলে। কিন্তু মূর্তি গুলির শিল্পমান ছিল অপেক্ষাকৃত নিরেট। অনুমান করা হয়, মূর্তিগুলি তৎকালীন অভিজাতবর্গের সংগৃহিত হলেও কখনই কুশল মৃৎশিল্পীদের দ্বারা সৃষ্ট নয়। বরং প্রামাণ্য তথ্যানুযায়ী সমকালে তার অনেকগুলিকেই তৎকালিক ইতরবর্গের দ্বারা নির্মিত শিল্প ও ব্যবহৃত বিগ্রহ হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে এমন একটি নারীমূর্তিও পাওয়া গেছে, যার জঠর থেকে উদ্গাত একটি উদ্ভিদের নিশানা স্পষ্ট দেখা যায়। ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদদের মতে এই মূর্তিটিকে সেকালে পৃথিবী দেবীর প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। পুরাকালে মধ্যপ্রাচ্যে পৃথিবীকে প্রজননসমর্থা জননীদেবী রূপে কল্পনা করা হতো। এই দেবীর পূজার্চনাও করা হতো মিশরিয় নীলনদের দেবী আইসিসের মতো করে। খুব সম্ভবতঃ হরপ্পা সভ্যতাতেও সে ধারনাকে অনুসরণ করা হয়েছিল। হরপ্পায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিলো কি না জানা নেই। বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবী দেবীর কিছু উল্লেখ পাওয়া গেলেও তাঁরা ছিলেন মূলতঃ গৌণ অস্তিত্ব। ব্রাহ্মণ্যধর্মে মাতৃদেবী যথা দুর্গার প্রভাব এসেছে ষষ্ঠ শতক পেরিয়ে। বলা ভালো, অম্বা, মনসা, চণ্ডী বা কালীর উপাসনা শুরু হয়েছিলো পুরাণযুগে এবং চণ্ডী ও কালী সরাসরি তন্ত্রসাধনার সূত্রেও যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায়, বিভিন্ন কৌম সমাজের নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে অগণন মাতৃদেবী নানারূপে ধর্ম, সাহিত্য ও ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছেন। এঁদের অধিকাংশ দেবীই কৌম সমাজ বা নিম্নবর্গীয় মানুষদের দ্বারাই

একসময় দেশ, কাল ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হরপ্পা সভ্যতার উৎখননে যে প্রচুর পোড়ামাটির নারীমূর্তিগুলি পাওয়া গিয়েছিল তার অধিকাংশ মূর্তিই ছিল বিবসনা ও কারুকেশসজ্জা বিশিষ্টা। কিছু ক্ষেত্রে দেবীর মুক্ত কেশভারই তাঁর লজ্জানিবারণাবরন। এঁর সাথেও কালী রূপকল্পনাটিকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। হরপ্পার বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব উপাস্যা দেবীর মূর্তি দেখে তাদের বিভিন্নতা অনুমান করা যায়। কল্লি উপজাতির দেবী (২৫০০-২০০০ খ্রি পূ), ঝব উপজাতির দেবী(২৫০০-২০০০ খ্রি পূ) বা সামগ্রিকভাবে হরপ্পা সংস্কৃতির দেবী (২০০০ খ্রি পূ), এঁদের মূর্তি প্রজননতন্ত্রী মাতৃদেবীর লক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্যনীয়, এই সব প্রাকৃতিক প্রজননশীলতার প্রতীক দেবীমূর্তি শুধু অনার্য জনগোষ্ঠীর উপনিবেশ থেকেই পাওয়া গেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের অনার্য জাতির মধ্যে অনেকক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থাকলেও তা মাতৃপূজা বা শক্তিপূজার প্রধান কারণ ছিল না। হরপ্পাযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতীয় কুলীন সমাজে মাতৃদেবীদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। আর্যতন্ত্রে যেসব দেবী কল্পনায় মাতৃভাবের অনুষঙ্গ রয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রজয়িতাসত্ত্বা হিসাবে যে সকল দেবীসত্ত্বা অগ্রাধিকার পেয়েছে,তাঁরাই মূলতঃ অনার্য কল্পনার ফসল। মহানির্বাণতন্ত্র ও ব্রহ্মযামলে দেবীর কৃষ্ণবর্ণকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা দার্শনিক রূপকের আয়োজন করা হয়েছে,কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বর্ণ কৃষ্ণা অনার্যমাতৃকার স্বীকৃতিমাত্র। অনার্যতন্ত্রে শক্তিকে 'ভগবতী'রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হতো এবং নারীর প্রজননক্ষমতাকেই 'শক্তি' আখ্যা দিয়ে সেই শক্তিরূপিনীকে দেবীরূপে কল্পনা করা হতো। কিন্তু আর্য দেবতাদের সঙ্গিনী এই দেবীকূল কখনও নিজ পরিচয়ে স্বনির্ভর ছিলেন না। তাঁরা সবাই সঙ্গী পুরুষ দেবতার শক্তিরূপিণী হয়েই পূজিতা হতেন। মূলতঃ অনার্য দেবী,পরে আর্যস্বীকৃত শিবের সঙ্গিনী বা কণ্যা হিসেবে যে সব দেবীরা কল্পিত হয়েছিলেন তাঁরাই হলেন পার্বতী, মহাদেবী, সতী, গৌরী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালী, চন্ডী এবং মনসা। এঁদের কারো কারো বিস্তারিত পরিচয়ই মধ্যযুগে আখ্যানাকারে বাংলা মঙ্গলকাব্য তথা শাক্ত কাব্যে পাওয়া যায়। ষোড়শ/ সপ্তদশ শতকে শক্তি (অর্থাৎ শিব ভার্যা) উপাসকদেরই মূলতঃ 'শাক্ত' বলে চিহ্নিত করা হয়। 'পীঠমালাতন্ত্র'-এ শিবের জবানিতে বলা হয়েছে,

ত্রিদন্ডী চ ভবে` দভক্ত, বেদাভ্যাসরতাঃ সদা ।
প্রকৃতিবাদরতাঃ শাক্তা, বৌদ্ধাঃ শূন্যাভিবাদিন ।।
অতর্দ্ধোগামিন য়ে বা তত্বজ্ঞা অপি তাদৃশা ।
সর্ব্বং নাস্তীতি চার্ব্বাকা জল্পন্তি বিষয়াশ্রিতা ।।

অর্থাৎ, যাঁরা বেদপাঠ করেন তাঁরা ত্রিদন্ডী,যাঁরা প্রকৃতিবাদী তাঁরা শাক্ত এবং যাঁরা শূন্যাদিবাদ নিরত তাঁরা বৌদ্ধ। বিষয়াশ্রয়ী চার্ব্বাকগণ এসমস্ত জানার পরেও নাস্তিক হয়ে থাকে। তাঁরা কোনও কিছুরই অস্তিত্ত্ব স্বীকার করেনা।

কালীতত্ত্ব পর্যালোচনায় দেখা যায় শাক্তসাধনার সাথে যুক্ত অপরাপর সাধনাটি হলো তন্ত্রসাধনা। একটি প্রচলিত অনুমান অনুযায়ী ভারতে ১৯২টি তন্ত্র প্রচারিত হয়েছিলো। এর মধ্যে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। গৌড়বঙ্গে প্রচারিত ও ব্যবহৃত ৬৪টি তন্ত্রের অনুগামীরা বিষ্ণুক্রান্ত নামে পরিচিত। বিষ্ণুক্রান্ত সম্প্রদায়ের ৬৪টি তন্ত্র থেকে আহরণ করে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 'তন্ত্রসার' নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। বিষ্ণুক্রান্ত সম্প্রদায় ব্যতিরেকে যে সম্প্রদায়টি নেপাল ও উত্তরের বিভিন্ন প্রান্তে অপর ৬৪টি তন্ত্রের বিধি অনুসরণ করেন, তাঁদের নাম 'রথাক্রান্ত'। মহানির্বাণ প্রভৃতি তন্ত্র এই রথাক্রান্ত সম্প্রদায়ের অনুসৃত পথ। আর্য ধারণানুযায়ী, তন্ত্রধারণার মূল বেদে সন্নিহিত এবং তন্ত্রসাধনার লক্ষ্য ব্রহ্মলাভ করা। কিন্তু এ ধারণা হেতু নিরপেক্ষ। তন্ত্র কোনও পৃথক অধ্যাত্মদর্শন বা মানুষের গভীর আত্মবিশ্লেষণের সাক্ষ্যবাহী ভূমা লাভ নয়। এটি একটি আচারভিত্তিক উপাসনাপদ্ধতি,যা প্রকৃতিবাদী কৌম জনগোষ্ঠী একসময় নিতান্ত ঐহিক প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবেই সৃষ্টি ও বিকশিত করে তুলেছিলো। বস্তুতঃ তন্ত্রসাধন একটি আদ্যন্ত জটিল ও বহুমুখী আচারভিত্তিক উপাসনা পদ্ধতি,যা পঞ্চ-মকারের মতো অনার্য,অব্রাহ্মণ,ইতরযানী লোকাচারের স্তম্ভের উপরই প্রতিষ্ঠিত,তাকে এভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বেদান্তবৃত্ত দিয়ে ঘিরে ফেলা আর্যসংস্কৃতির অন্তঃস্থ শক্তির দম্ভকেই প্রকাশ করে। তন্ত্র মূলতঃ ইতরজনের বিকশিত অধ্যাত্মসন্ধান। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মই প্রথম ইতরজনের অধ্যাত্ম প্রয়োজনকে

স্বীকৃতি দিয়েছিলো। আর্য প্যাগান সভ্যতার নানা প্রকৃতি-প্রতীক দেবতার স্তর পেরিয়ে আসার পরও কিন্তু সংখ্যাগুরু অনার্য মানুষের কাছে প্রকৃতির মাতৃতন্ত্র ও পুরুষের সৃজন তন্ত্রের তত্ত্ব সন্ধানই প্রধান অধ্যাত্ম কৃত্য ছিলো। কৌম সমাজের মানুষের কাছে তান্ত্রিক অধ্যাত্ম দর্শনের আবেদন চিরকাল থাকলেও গোষ্ঠীবদ্ধ বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাকে সরাসরি কখনই স্বীকার করেনি।

শাক্তদের উপাসনা পদ্ধতিটির নাম 'তন্ত্রাচার'। আদিম কৌম সমাজের প্রকৃতিপূজা, জাদুভেল্কি, অলৌকিকের প্রতি কৌতূহল ইত্যাদি ক্রমশঃ পরিস্রুত হতে হতে একটা অন্যধরনের সাধনপদ্ধতি হয়ে গড়ে উঠেছিলো তন্ত্র যার আচরিত আচারকেই প্রকারান্তরে 'তন্ত্রাচার' নাম দেওয়া যায়। বস্তুতঃ ষোড়শ শতক থেকেই দেবী হিসেবে কালী এবং দশমহাবিদ্যার সাধনা তন্ত্রচর্চার প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। এইসময় কালীপূজার বিধান রচনা করেন বিখ্যাত শাক্তসাধকেরা। এঁদের মধ্যে প্রধান নামগুলি কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং পূর্ণানন্দ। এছাড়া ত্রিপুরার মেহরগ্রামের সর্বানন্দ ঠাকুর ছিলেন অতি প্রসিদ্ধ সাধক। কথিত আছে তিনি ভৃত্য পূর্ণানন্দের দেহের উপর আসীন হয়ে শবসাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন এবং দশমহাবিদ্যার সাক্ষাৎও লাভ করেন। তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর বংশধরেরা 'সর্ববিদ্যার বংশ' নামে খ্যাত ছিলেন। এদিক থেকে নারীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার সাধক দ্বিজদেবের কন্যা জয়দুর্গা,যিনি 'অর্ধকালী' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন,স্বয়ং মহেশ্বরী হিসেবে তন্ত্রজগতে তিনি পূজিতা হতেন। 'তন্ত্রাচার' বৈদিক উপাসনা পদ্ধতির থেকে বিশেষরূপে ভিন্ন। এই আচারে দেবতার (অথবা দেবীর) প্রতিমূর্তি নির্মান করে মন্ত্র দিয়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তার পর ঐ প্রতিমূর্তিকে সাক্ষাৎ সজীব দেবতা জ্ঞানে আহ্বান করা হয়। এই পূজা পদ্ধতির বিভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, গন্ধ, নৈবেদ্য, বস্ত্র প্রদান ও সাধকের অধিকারী ভেদে 'পঞ্চ ম'-কার সহযোগে অর্চনা করা। সনাতন ধর্মের শাক্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানী শক্তিচর্চাকে সতত মিলিয়ে দেখা হয়। কারণ বাংলাদেশে তন্ত্রচর্চার প্রধান ধারাটি মূলতঃ বজ্রযানের পথ ধরেই এসেছিলো। হিউ এন সাং এর রচনায় (৬৩০ থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ রয়েছে যে ব্রাহ্মণরা বহুদিন থেকেই অথর্ববেদ অনুযায়ী তন্ত্রমন্ত্রের সাধনা করতেন। এই মার্গেও পঞ্চ-ম-কারের স্বীকৃতি রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ-ম-কারের প্রসঙ্গ বৌদ্ধ বজ্রযান থেকে গৃহীত হয়েছে। তন্ত্র সাধনার আর এক গুহ্যরীতি হলো কৌলাচার ও মদ্যপান। এ বিষয়ে সাক্ষী মানা হয়েছে 'আগমসার' নামক একটি প্রাচীন গ্রন্থের । এই গ্রন্থে প্রথম-ম, অর্থাৎ 'মদ্য' সাধন বিষয়ে বলা হয়েছে,

'' সোমধারা ক্ষরেদ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ বরাননে ।
পীত্বানন্দময়ীং তাং য স এব মদ্যসাধকঃ ।।''

এর তাৎপর্য হলো: "হে পার্বতি ! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিলে, লোকে আনন্দময় হয়, ইহারই নাম মদ্যসাধক।" মাংসসাধনা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, "মা, রসনা শব্দের নামান্তর, বাক্য তদংশভূত ; যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাকেই মাংসসাধক বলা যায়। মাংসসাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্যসংযমী মৌনাবলম্বী যোগী।" মৎসসাধনার তাৎপর্য আরও গূঢ় ও প্রতীকী। "গঙ্গা-যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য সতত চরিতেছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি মৎস্য ভোজন করে, তাহার নাম মৎস্যসাধক।" আধ্যাত্মিক মর্ম গঙ্গা ও যমুনা, ইড়া ও পিঙ্গলা; এই উভয়ের মধ্যে যে শ্বাস-প্রশ্বাস, তাহারাই দুইটি মৎস্য, যে ব্যক্তি এই মৎস্য ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ প্রাণায়ামসাধক শ্বাস-প্রশ্বাস, রোধ করিয়া কুম্ভকের পুষ্টিসাধন করেন, তাঁহাকেই মৎস্যসাধক বলা যায়। মুদ্রাসাধনার তাৎপর্য এ রকম, ".... শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকাভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদতুল্য আত্মার অবস্থিতি, যদিও ইহার তেজঃ কোটিসূর্য্যসদৃশ, কিন্তু স্নিগ্ধতায় ইনি কোটি চন্দ্রতুল্য। এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর এবং কুন্ডলিনী শক্তি সমন্বিত, যাঁহার এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত মুদ্রাসাধক হইতে পারেন।"

মৈথুনতত্ত্ব সম্বন্ধে 'অতি জটিল' বিশেষণ আরোপ করা হয়েছে 'আগমসার' গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে, মৈথুনসাধক পরমযোগী। কারণ তাঁরা "বায়ুরূপ লিঙ্গকে শূন্যরূপ যোনিতে প্রবেশ করাইয়া কুম্ভকরূপ রমণে প্রবৃত্ত

হইয়া থাকেন।" আবার অন্য ঘরানার তন্ত্রে বলা হচ্ছে, 'মৈথুনব্যাপার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, ইহা পরমতত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মৈথুন ক্রিয়াতে সিদ্ধিলাভ ঘটে এবং তাহা হইলে সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে।' শারীরিক মৈথুনের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন,আলিঙ্গন,চুম্বন,শীৎকার,অনুলেপ,রমণ ও রেতোৎসর্গ,তেমনই আধ্যাত্মিক মৈথুন ও যোগক্রিয়ায় তার সমান্তরাল কৃত্যও কল্পনা করা হয়েছে। সেখানে 'তত্ত্বাদিন্যাসের' নাম 'আলিঙ্গন',ধ্যানের নাম 'চুম্বন', আবাহনের নাম 'শীৎকার',নৈবেদ্যের নাম 'অনুলেপন',জপের নাম 'রমণ' আর দক্ষিণান্তের নাম 'রেতঃপাতন'। এই সাধনাটির নাম 'ষড়ঙ্গসাধন'।

বলাবাহুল্য বজ্রযানী বৌদ্ধমতেরও মূল দুটি শর্ত হচ্ছে, গুরু ব্যতিরেকে তন্ত্র সাধনা নিষেধ আর বোধিচিত্ত তথা শক্তিপূজা করতে গেলে নরনারীর শারীরিক মিলন অনিবার্য ও অবশ্যকৃত্য। গুরুর পাশাপাশি তন্ত্রসাধনায় মন্ত্রের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। শিষ্যের দীক্ষাকালে গুরু তাকে 'বীজমন্ত্র' উপদেশ দেন। 'বীজমন্ত্র' বিভিন্ন ইষ্ট দেব-দেবীর জন্য পৃথক হয়। সব ধরনের 'বীজমন্ত্র'ই অতীব গুহ্য, তাই তন্ত্রকারেরা তাদের গোপন রাখার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সাংকেতিক শব্দ ও তার নতুন অর্থ সৃষ্টি করেছেন। এই সব শব্দের যে সব অর্থ করা হয় তা শুধুমাত্র তন্ত্রশাস্ত্রে অধিকারী ব্যক্তিরাই উদ্ধার করতে পারেন। বিভিন্ন তন্ত্র যথা পিচ্ছিলা তন্ত্র, বিশ্বসার তন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র প্রভৃতিতে গুরুর বিভিন্ন স্বীকৃত লক্ষণ বিবৃত হয়েছে। গুরুকে সর্ব শাস্ত্র পরায়ণ, নিপুণ, সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ, মিষ্ট ভাষী, সুন্দর, সর্বাবয়ব সম্পন্ন, কুলাচার বিশিষ্ট, সুদৃশ্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ইত্যাদি গুণশীল হতে হবে। একই নিয়মে শিষ্যের জন্যও নানা লক্ষণ নির্দিষ্ট রয়েছে।

এককথায় শাক্ত ধর্ম এক সহজিয়া ধর্ম। বৌদ্ধ তন্ত্রযানের যে তিনটি প্রধান ধারা আছে,কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান, তার মধ্যে সহজযান অর্বাচীনতম। বজ্রযান থেকে উদ্ভূত সহজযানকেও সহজিয়া ধর্ম বলা হয়। ব্রাহ্মণ্য দর্শনের জটিল বহুস্তর তত্ত্ব ও অগণন লোকাচারের বিপরীতে সহজযান বা সহজিয়া ধর্ম একসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইতর মানুষের অবলম্বন হয়ে উঠেছিলো। চর্যাপদ থেকে বাউলদর্শনের দেহতত্ত্ব পর্যন্ত সব কৌমদর্শন ও লোকাচারে এই সহজিয়া ধর্মই একদা গোটা ভারতবর্ষে ব্যপ্ত হয়ে ছিল। আর্যসৃষ্ট বেদ পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য আর্য পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে এসেছে । এরই শেষাংশ হলো অথর্ব। যদিও বহু ধীমান দার্শনিক অথর্ববেদকে বেদের অংশ হিসেবে স্বীকার করেন না, তথাপি অথর্ববেদ বস্তুতঃ আদিম কৌম সমাজেরই নানা বিধিব্যবস্থা, রীতিপদ্ধতি,আচারবিচারের সম্পাদিত সংকলন, যা ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থা একসময় নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে স্বীকার করে নিয়েছিলো। এই বেদের এক বিরাট অংশ জুড়েই রয়েছে 'অকাল্ট'চর্চার নানা প্রসঙ্গ যা কোনোভাবেই আর্যদর্শনের সঙ্গে সাযূজ্যপূর্ণ নয়। তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্য হিসেবে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধিত কুলকুন্ডলিনী জাগরণ বিষয়ক যে সন্দর্ভ প্রাধান্য পেয়ে থাকে,তার সঙ্গে ব্রহ্মকেন্দ্রিক গভীর অধ্যাত্মদর্শন সম্পৃক্ত ভাবনাচিন্তাও সমস্তরে মেলেনা, বরং যোগদর্শনের সঙ্গে তার সম্যক সাযূজ্যতা আছে।

শাক্তদের মধ্যে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের নাম পশ্বাচারী ও বীরাচারী। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল প্রভেদ হচ্ছে বীরাচারে পঞ্চ-ম কারের প্রচলন আছে, পশ্বাচারে তা নেই। 'কুলার্ণব'তন্ত্রে এই দুইভাবকে এইরূপে বর্ণনা করা হয়েছে:

'সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তম শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম।।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলৎ পরতরং ন হি ।।'

অর্থাৎ, 'কুলার্ণব'তন্ত্রে এই দু প্রকার আচারকে সাত ভাগ করা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, বেদাচার উত্তম (এই বেদাচারের সঙ্গে বৈদিক আচারের কোনও সম্পর্ক নেই), বেদাচারের থেকে বৈষ্ণবাচার উত্তম, বৈষ্ণবাচার থেকে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার থেকে দক্ষিণাচার উত্তম, দক্ষিণাচার থেকে বামাচার উত্তম, বামাচার থেকে সিদ্ধান্তাচার উত্তম, সিদ্ধান্তাচারের চেয়ে কৌলাচার উত্তম। কৌলাচারের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই এ প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের

পদটিও খুবই প্রাসঙ্গিক। পদটি এমনঃ 'রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে পতিত হবি কুল ছাড়িলে/ মন ভুলোনা কথার ছলে...' এখানে 'কুল' শব্দ দ্ব্যর্থবোধক। তা বংশসম্প্রদায় ও কৌলাচারের প্রতি আনুগত্য দুইই বোঝায়। স্বয়ং রামপ্রসাদ পুরো দস্তুর বীরাচারী বা কুলাচারী তন্ত্রসাধক ছিলেন। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরের সস্ত্রীক শ্মশানে বসে শবসাধনা, শবের উপর মহাশঙ্খ মালাজপ, ভগবতীর আবির্ভাব ইত্যাদি কৌলাচারের বিবরণ আছে। আবার কুলক্রিয়া সমাপনান্তে তিনি যখন ভাবোন্মাদ হয়ে বাইরে আসতেন তখন কুমারহট্ট পন্ডিতসমাজের শিরোমণি বলরাম তর্কভূষন তাঁকে 'মাতাল' বলে নিন্দা করতেন আর এর উত্তরে রামপ্রসাদ বলতেন,

মন ভুলোনা কথার ছলে
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে
সুরাপান করিনা আমি
সুধা খাই জয় কালী বলে
আমায় মন-মাতালে মাতাল করে
আর মদ-মাতালে মাতাল বলে...

তবে প্রথাগত তন্ত্রসাধনার ঊর্ধে রামপ্রসাদ ছিলেন একইসঙ্গে এক কালজয়ী কবি ও সঙ্গীতকার। তাই রামপ্রসাদের গুহ্যতন্ত্র সাধনার সাফল্য-ব্যর্থতার বিষয়টি জনমানসে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি, কারণ তিনি ছিলেন প্রথমে কবি, পরে তন্ত্রসাধক।

পশুবধ তথা বলিদান তন্ত্র ও পুরাণের একটি প্রাচীন প্রথা অথবা ধর্মীয় লোকাচার। প্রাগৈতিহাসিক ধর্মীয় লোকাচারটি আদিকাল থেকে বিভিন্ন কৌমসমাজে প্রচলিত আছে। এই প্রথাটি মূলত প্রজননতন্ত্র বা ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে যুক্ত। সুমেরু সভ্যতা, মিশর বা ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতা, আজটেক সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা এমনকি ইহুদি,খ্রিস্টিয় ও ইসলাম ধর্মেও [আব্রাহাম তাঁর পুত্র স্যামুয়েলকে 'ঈশ্বর'কে প্রীত করার জন্য যখন বলি দিয়েছিলেন] বলিদানের উদাহরণ আছে। হেলেনিক ও রোমান সভ্যতা, উভয় ক্ষেত্রেই প্রচুর নরবলির কথা শোনা যায়। মাইথনের কল্যাণেশ্বরী মন্দির, রাজরপ্পায় ছিন্নমস্তা মন্দির বা রামচন্ডীতে চন্ডীমন্দির, সম্বলপুরে সম্বলেশ্বরী মন্দির বা হায়দরাবাদে বকরিদ বিভিন্ন পার্বণ উপলক্ষ্যে পশুহত্যার যে উল্লসিত উদযাপন চোখে পড়ে, তা এই লোকায়ত ঐতিহ্যেরই প্রাচীন অনুসন্ধান। শক্তিসাধনায় বলিপ্রথা আদিকাল থেকে চলে এসেছে। কালিকাপুরাণে বলা হয় বলিদানের জন্য পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, মৎস,নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, গোধিকা, গো, ছাগ, নকুল, শূকর, গন্ডার, কৃষ্ণসার, সরভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মনুষ্য, স্বীয় শরীরের রক্ত সবই চন্ডিকা-ভৈরবাদির বলিদানের জন্য প্রশস্ত এবং এই বলিদানের দ্বারা স্বর্গসাধন ও মুক্তিলাভ হয়। 'পদ্মপুরাণ' মতে,

'মদর্থে শিব কুর্বন্তি তামসা জীবঘাতনম।
আকল্পকোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়োঃ।।'

[অর্থাৎ পার্বতী বলছেন, 'হে শিব,যে সব তামসিক ব্যক্তি আমার নিমিত্ত জীবহত্যা করে তাদের নিঃসংশয়ে কোটিকল্প নরকবাস হয়।']

তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য পূজক বা সাধকের প্রতি অর্চনার যে বিধি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা এইরকমঃ 'যে কালীভক্ত একাগ্রচিত্তে সিন্দূরতিলকান্বিত হইয়া,তাম্বুলপূরিত মুখে,মুক্তকেশ,দিগম্বরবেশে শবযোনি অথবা শক্তিযোনিতে স্থিত অবস্থায় অথবা শ্মশানে সুরতান্বিত হইয়া,শূন্যালয়ে,সিদ্ধপীঠে অথবা পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত শিবালয়ে মূলাধারস্থিত কুন্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া সহস্রদল কমলস্থ শিবের সহিত যোগ করিয়া খেচরী মুদ্রা দ্বারা সহস্রদল কমলনিঃসৃত অমৃতপান করে,সে কালীর দর্শন পায়।' তন্ত্রে দুটি মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে,খেচরী মুদ্রা ও শাম্ভবী মুদ্রা। খেচরী মুদ্রায় মন অবলম্বন বিনা স্থির থাকে, প্রাণবায়ু সমাধি ছাড়াই স্থিরভাব ধারণ করে আর দৃষ্টিতে কোনও

দর্শন থাকেনা। শাম্ভবী মুদ্রা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'বালক ও মূর্খের মন যেরূপ শয়ন না করিয়াও নিদ্রা যায়,তদ্বৎ যিনি বিনা অবলম্বনেই গমন করিতে পারেন' তিনিই শাম্ভবী মুদ্রার অধিকারী।

শক্তি সাধনায় কৌলাচার ও সাধনসঙ্গিনী হিসাবে নারীর ব্যবহার তন্ত্রশাস্ত্র সম্মত। কৌলাচার শাক্তসাধকের দ্বারা কৃত এক নিয়ম নিষ্ঠাচার। কিন্তু কৌলাচারের জন্য কোনও দিন,কাল,তিথিনক্ষত্র ইত্যাদির নিয়মবদ্ধতা নেই। কৌলাচারী শিষ্ট-ভ্রষ্ট,ভূত-পিশাচ,কর্দম-চন্দন,পুত্র-শত্রু,কাঞ্চন-তৃণ বা শ্মশান-গৃহে ভেদজ্ঞান করেন না। কৌলাচারের পূজাপদ্ধতির সঙ্গে বিষ্ণুপ্রধান আর্য পূজা উপচারের মৌলিক পার্থক্য আছে। সাধনসঙ্গিনী হিসাবে ব্যবহৃত নারীরও আবার নানারূপ প্রকারভেদ বর্তমান। যেমন,সাধনসঙ্গিনী হিসেবে পদ্মিণী নারী শান্তিদায়িনী। সে হবে গৌরাঙ্গী,দীর্ঘকেশী,সর্বদা অমৃতভাষিণী ও রক্তনেত্রা। শঙ্খিণী নারী হয় মন্ত্রসিদ্ধকারী। সে হবে দীর্ঘাঙ্গী এবং নিখিল জনরঞ্জনকারিণী। যে নারী নাগিনী গোত্রের,তার লক্ষণ হলো শূদ্রতুল্যদেহধারিণী, নাতিখর্বা, নাতিদীর্ঘ, দীর্ঘকেশী, মধ্যপুষ্টা ও মৃদুভাষিণী। কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, দন্তুরা, মদতাপিতা, হ্রস্বকেশী, দীর্ঘঘোণা,নিরন্তর নিষ্ঠুরবাদিনী, সদাক্রুদ্ধা, দীর্ঘদেহী, নির্লজ্জা, হাস্যহীনা, নিদ্রালু ও বহুভক্ষিণী নারীকে 'ডাকিনী' বলা হয় (যোগিনীতন্ত্রম)। সাধনসঙ্গিনী নির্বাচনের যে প্রথাপ্রকরণ এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,সেখানে নারীকে একধরনের বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে বোধ হতে পারে। নামে 'নারী শক্তি' হলেও শক্তি সাধনার ষটকর্মে সাধনসঙ্গিনীর যে সব লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে তা থেকে নারীর অসম্মাননা বা অবমাননার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ষোড়শ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে গুহ্যতন্ত্রসাধনা এক বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। তন্ত্র আরাধনা ষোড়শ শতক পর্যন্ত এক গুহ্যসাধনপদ্ধতিই ছিলো। এর পর বিদেশী মুসলমান রাজশক্তির নিষ্পেষনে মূলস্রোতী ও উচ্চকোটীর বিপর্যস্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচলিত বিষ্ণুকেন্দ্রিক বিগ্রহপূজা শরণ নিলো কৌম সমাজের দেবীকূলের আশ্রয়ে। অষ্টম ও নবম শতকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে অভিনব গুহ্য সাধনতত্ত্ব ,নীতিপদ্ধতি ও পূজা আচারের প্রসার দেখা যায়। এর মূল হিসেবে যে কারণ আমরা পাই তাও বেশ অভিনব। আচার্য অসঙ্গ অরণ্য ও পর্বতবাসী বৃহত্তর কৌম সমাজকে বৌদ্ধ ধর্মের সীমার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সেই সমাজের প্রচলিত ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবীকে মহাযানী প্যান্থিয়নের মধ্যে স্থান করে দিলেন। নানা গুহ্য মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী, বীজ, মন্ডল ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিলেন যা আদিম কৌম সমাজের কাছে জাদুশক্তির মতোই বিশ্বাসের অঙ্গ ছিলো। প্রকৃত অর্থে শাক্তমতও মহাযানী গুহ্যতন্ত্রসাধনার সমতুল্য। শাক্তমতে পূজার্চনা কখনও প্রকাশ্যে পালন করা হতোনা। রাজশক্তির অগোচরেই এই সাধনপদ্ধতি অভ্যাস করা হতো। আসলে তন্ত্র কোনও ধর্মীয় মতবাদ নয়,তন্ত্র এক বিশেষ সাধনপদ্ধতি মাত্র। অপ্রকাশ্য সাধনপদ্ধতি বলেই এর আর এক নাম হলো গুহ্যতন্ত্রসাধনা। মনুষ্যদেহকে যন্ত্রস্বরূপ বিচার করে সেই সূত্রে গুহ্যসাধনপদ্ধতিকেই 'তন্ত্র' বলে। এই সাধনপদ্ধতিতে অনুগামীদের বিভিন্ন দেবীর নামে দীক্ষা নিতে হয়। বাংলায় শাক্তরা জগদ্ধাত্রী মন্ত্রেই অধিক দীক্ষিত হন। অন্নপূর্ণা,ত্রিপুরা ও ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে দীক্ষিত শাক্তদের সংখ্যা বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত কম। 'সূত্রকৃতঙ্গ' নামের একটি অতিপ্রাচীন জৈন গ্রন্থ জানাচ্ছে তন্ত্রের অতি গূঢ় সাধনপদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠান শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, গৌড় দেশবাসী ও গন্ধর্বদের মধ্যে অধিক প্রচলিত ছিলো। একথা প্রমাণিত যে, তন্ত্রধর্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি ব্রাত্যধর্ম এবং বৌদ্ধ ও সনাতনধর্ম নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধিত করার জন্য একসময় তাকে আত্তীকরণ করেছিলো। তন্ত্রের জগতে কোনও জাতিভেদ নেই। এছাড়া আর্যশাস্ত্রানুকূল ব্রাহ্মণ্যমতে ঘৃণাত্মক ক্রিয়াকলাপ, যেমন, শবসাধনা, পঞ্চমুন্ডি-আসন, পঞ্চ-ম-কার ইত্যাদি আর্যমতের ভ্রষ্টাচার, ইতরযানী মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোত ছিলো। শুধু তাই নয়, যাকে সাবেকী ভাষায় 'ম্লেচ্ছপুষ্প' বলা হয় সেই 'হিবিস্কাস রোজা সাইনেন্সিস' বা পঞ্চমুখী রক্তজবাও এককালে আর্যজনোচিত শ্বেতগন্ধপুষ্পকে বিলীন করে হয়ে উঠেছিলো কালীপূজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপচার। তবে মন্ত্রশক্তি মহাশক্তি। 'তন্ত্রকল্পদ্রুম' গ্রন্থে বলা হয়, নিষ্ঠাবান সাধক সারাদিন বিভিন্ন প্রহরে সহস্রবার অভীষ্ট মন্ত্র বা 'তারা' নাম জপ করলে তিনি মহাকালীকে তুষ্ট করতে সক্ষম হন। ফলতঃ দেবী নিজে তাঁর মধ্যে আবির্ভূতা হন এবং তিনিও স্বয়ং কালিকারূপ ধারণ করতে পারেন।

ভারতবর্ষে এখনও কিছুক্ষেত্রে তন্ত্রসাধকদের সঙ্গে কাপালিকদের এক করে দেখা হয়। কিছু স্থূল সাদৃশ্য থাকলেও এ দু'টি ভিন্ন সাধনধারা। কাপালিক নামে এক ধরনের শৈব যোগী গোষ্ঠী রয়েছেন,যাঁরা নরকপালে (করোটিতে) পানভোজন করে থাকেন। এঁদের সাধনা মূলতঃ কিছু অতিজাগতিক অতীন্দ্রিয় শক্তি অধিগত করা। চামুন্ডাপূজক বামাচারীদের মধ্যেও কাপালিক দেখা যায়। লোককথা অনুযায়ী শিবের অংশে জাত উপদেবতা কালভৈরব প্রথম কাপালিক, যিনি শিবের নির্দেশে প্রজাপতি ব্রহ্মার পঞ্চম মুন্ডটি কর্তন করে সেই করোটিতে রক্তপান করেন। এই যোগীরা বস্তুত অঘোরপন্থী এবং এরা সর্বদা নরকরোটি ও নর-অস্থি দন্ড-কমন্ডলু হিসেবে ব্যবহার করে। বহু পূর্বে এরা নিয়মিত নরবলিও দিতেন। তন্ত্রসাধকের কাছে তন্ত্র একটি সাধনা আর তান্ত্রিকের কাছে তা পেশাগত চর্চামাত্র; অনেকক্ষেত্রেই যা নগদবিদায়ের একমাত্র অবলম্বন। প্রসঙ্গত বলা যায়, বৈষ্ণবাচার ও শাক্তাচারের মধ্যেও দৃঢ় পার্থক্য আছে। নিত্যাতন্ত্র অনুসারে বেদাচার ও বৈষ্ণবাচারে হিংসা,নিন্দা,কুটিলতা,মাংসভোজন,রাত্রিতে মালা ও যন্ত্রস্পর্শ তথা মৈথুন পরিত্যজ্য। অথচ শৈবাচারে পশুহত্যার বিধান আছে। দক্ষিণাচারে ভগবতীর পূজা ও রাত্রিকালে বিজয়গ্রহণ করে মন্ত্রজপ করতে হয়। বামাচারে মদ্য-মাংস পঞ্চতত্ত্ব ও খপুষ্প সহকারে বামাস্বরূপা কুলস্ত্রীর পূজা করতে হয়। সিদ্ধান্তাচারে অহরহ দেবপূজায় অনুরক্ত থেকে দিবাভাগে বিষ্ণুপরায়ণ ও রাত্রিতে যথাবিধি মদ্যাদি দান ও সেবন করতে হয়। আবার তান্ত্রিক উপাসনাপদ্ধতিও প্রাথমিকভাবে একটি লোকাচারনির্ভর ক্রিয়া এবং এর লোকাচারের রূপ,সময় ও গণরুচির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ পাল্টে যায়। জন্মসূত্রে অহিন্দু তন্ত্রসাধকও দেখা গেছে। বাউলসাধনা ও তন্ত্রসাধনাও প্রায় সমান্তরাল দুটি ধারা। দুটি পথই মূলত কৌম সমাজের অবলম্বন। ব্রাহ্মণ্য অনুপ্রবেশ ঘটলেও এই ধারণাগুলি মূলতঃ হৃদয়সঞ্জাত,গোষ্ঠীগত ধর্মচেতনা থেকে তারা একটু দূরেই অবস্থান করে। সব মিলিয়ে বলা চলে, দীর্ঘকাল ধরেই প্রান্তিক ও অন্ত্যজ জনের সঙ্গে কালী ও তন্ত্রের সাব অল্টার্ন ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

কালী তত্ত্বানুযায়ী ভারতবর্ষে দেবী কালীকে একটি অনার্য অডিসি হিসাবে দেখা হয়। তাই প্রাচীনকালে কালীপূজানুষ্ঠানকে কোথাও কোথাও শবরোৎসবের তুল্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চোপাসক হিন্দু বিদ্যাপতি কালিকা পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এমন এক শবরোৎসবের কথা বলেছিলেন। বিদ্যাপতির মতেঃ 'কুমারী, বেশ্যা, নর্তকীদের নিয়ে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, ঢোল বাজিয়ে বহুবিধ ধ্বজা বস্ত্র সহ খৈ, ফুল ছড়িয়ে, পরস্পরের প্রতি ধুলো কাদা ছিটিয়ে, ক্রীড়া ও কৌতুক গান করতে করতে যাত্রা করবে, ভগলিঙ্গ, যৌনউত্তেজক গান এবং তদৃশ্য বাক্যালাপ করে আনন্দ করবে। এই সময় যে ব্যক্তি অশ্লীলতা ভালোবাসেনা বা নিজে ও অপরের বিরুদ্ধে এরূপ শব্দ ব্যবহার করেনা ভগবতী ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাপ দেবেন এবং বিনাশ করবেন।'

বৃহদ্ধর্ম পুরাণেও এই শবরোৎসবের বর্ণনা আছেঃ

'ভগ লিঙ্গাভিধানৈশ্চ শৃঙ্গার বচনৈ স্তথা –
গানং কার্যং ভোজয়চ্চ ব্রাহ্মনাৎ স্তোষয়েস্ত্রিয়া'।

(বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ২২ অধ্যায়)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তন্ত্রোক্ত প্রকৃতিদেবী হিসাবে কালীর কোনো রূপ স্বীকৃতি ছিলনা। সেখানে গণেশজননী দেবী দুর্গা রূপে তাঁর অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে। শারদীয় বা বাসন্তী পূজার্চনার সময় মার্কন্ডেয় পুরাণের মন্ত্র উপচারের ছকটি অনুসরণ করা হয়। মার্কন্ডেয় পুরাণে 'শ্রীশ্রী চন্ডী' অংশে বলা হয় চন্ডিকাদেবী সত্যযুগে শ্রীদুর্গা রূপে মহিষাসুরকে বধ করতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তার পর শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরকে বধ করার জন্য শ্রীকৌষিকী বা অম্বিকাদেবী বা শ্রীকালী মূর্তিতেও আবির্ভূতা হয়েছিলেন। কালীতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থটির নাম হলো 'কালিকা পুরাণ' (খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী)। এটি একটি হিন্দুধর্মগ্রন্থ। এটি অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্যতম। প্রাপ্ত পাঠটিতে ৯৮টি অধ্যায় ও ৯০০০ শ্লোক রয়েছে। এটি কালী ও তাঁর কয়েকটি বিশেষ রূপের (যথা, গিরিজা, ভদ্রকালী ও মহামায়া) উদ্দেশ্যে রচিত একমাত্র গ্রন্থ। এই পুরাণে কামরূপ তীর্থের পর্বত ও নদনদী এবং কামাখ্যা

মন্দিরের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কালী, কামাখ্যা ও দুর্গা সহ বিভিন্ন দেবীর পূজাপদ্ধতি এই পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। সেই কারণে এটি হিন্দুধর্মের শাক্ত-শাখার অন্যতম শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ। সম্ভবত এই গ্রন্থ কামরূপ (বর্তমান অসম) বা বঙ্গদেশে লিখিত হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের স্মার্ত লেখকগোষ্ঠী এটিকে শাক্তধর্মের একটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। এই পুরাণে বেশ কিছু পূর্বপ্রচলিত পৌরাণিক পাওয়া যায়। কালিকা পুরাণের সবচেয়ে পুরনো মুদ্রিত সংস্করণটি হল ১৯০৭ সালে প্রকাশিত বোম্বাই ভেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণটি। এরপর ১৯০৯ সালে কলকাতার বঙ্গবাসী প্রেস থেকে এর প্রথম মুদ্রিত বাংলা সংস্করণটি প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষে শৈব বাদ, ভাগবতবাদ আর শাক্তবাদের মধ্যে শাক্তবাদই সার্বভৌম। কালী বা কালিকা নামক শাক্তধর্মাবলম্বীদের পূজিতা হিন্দু দেবীর অন্য নাম শ্যামা বা আদ্যাশক্তি। তন্ত্রশাস্ত্র মতে, তিনি 'দশমহাবিদ্যা' নামে পরিচিত অথবা তন্ত্রমতে পূজিত প্রধান দশ জন দেবীর মধ্যে প্রথম দেবী। শাক্তরা কালীকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদিকারণ মনে করে। বাঙালি হিন্দু সমাজে দেবী কালীর মাতৃরূপের পূজা বিশেষ জনপ্রিয়। শাস্ত্র ও পুরাণে শক্তির উৎস দেবী কালীর নানা রূপকে স্বীকার করা হয়। কথিত আছে, একবার বশিষ্ঠ মুনি দেবীর মাতৃরূপ দর্শন চান৷ দেবীও তাঁকে নিরাশ করেননি৷ তবে সুযোগটা আসে সমুদ্র মন্থনের সময়৷ সমুদ্রমন্থনে ওঠা বিষপান করে তখন সঙ্কটাপন্ন মহাদেবের জীবন৷ মহাদেবকে বাঁচাতে সন্তান রূপে তাঁকে স্তন পান করান দেবী৷ সেই থেকে তারাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী তিনি৷কালীঘাটের কালীর প্রতিমূর্তিতে দেখা যায় দেবী লোলজিহ্বা, চতুর্ভূজা ও নকুলেশ্বর নামের শিবের উপরে স্থিত। মূল মূর্তির জিভটি আরও দীর্ঘ ও স্বর্ণনির্মিত। 'আদিকালী'র দ্বিভূজা মূর্তি। গলায় মুণ্ডমালা অনুপস্থিত, দুই হাতে বর ও অভয় এবং দেবী শিবের বক্ষের উপর দণ্ডায়মান। 'দুর্গাকালী' দুর্গা ও কালীর যৌথ রূপ। দেবীর অর্ধাংশে দুর্গা ও অর্ধাংশে কালী। দুর্গার অংশটি পঞ্চভূজা ও কালীর অংশটি দ্বিভূজা। সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করে দেবী মহিষাসুরবধরত। পাশে শিব দণ্ডায়মান। পুরাণ ও তন্ত্র গ্রন্থগুলিতে কালীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে তাঁর মূর্তিতে চারটি হাতে খড়্গ, অসুরের ছিন্নমুণ্ড, বর ও অভয়মুদ্রা; গলায় মানুষের মুণ্ড দিয়ে গাঁথা মালা; বিরাট জিভ, কালো গায়ের রং, এলোকেশ দেখা যায় এবং তাঁকে তাঁর স্বামী শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বাঙালী গৃহে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালীপ্রতিমার নিত্যপূজা হয়। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ তিথিতেও কালীপূজার বিধান আছে। আবার বিভিন্ন মন্দিরে 'ব্রহ্মময়ী', 'ভবতারিণী', 'আনন্দময়ী', 'করুণাময়ী' ইত্যাদি নামেও কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও পূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথিতে 'দীপান্বিতা কালীপূজা' বিশেষ জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। এছাড়া মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে 'রটন্তী কালীপূজা' এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে 'ফলহারিনী কালীপূজা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও শনি ও মঙ্গলবারে, অন্যান্য অমাবস্যায় বা বিশেষ কোনো কামনাপূরণের উদ্দেশ্যেও কালীর পূজা করা হয়। দীপান্বিতা কালীপূজা বিশেষ জনপ্রিয়। এই উৎসব সাড়ম্বরে আলোকসজ্জা সহকারে পালিত হয়। তবে এই পূজা প্রাচীন নয়। কোথাও কোথাও কালীপ্রতিমার সহিত দশমহাবিদ্যাও পূজিত হন। চামুন্ডাচর্চিকা কালী পূজা বাংলা ও বহির্বঙ্গে প্রাচীন উৎসব হলেও মূলতঃ তা সপ্তদশ শতকেই বাংলায় জনপ্রিয় হয়। ষোড়শ শতকে নবদ্বীপের স্মার্ত পন্ডিত তথা নব্যস্মৃতির স্রষ্টা রঘুনন্দন দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজার বিধান দিলেও, কালীপূজার উল্লেখ করেন নি। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৬৮) কাশীনাথ রচিত শ্যামাসপর্যাবিধি গ্রন্থে দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালী পূজার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ['স্বর্গত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে ১৬৯৯ শকাব্দে (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে) কাশীনাথ-রচিত 'শ্যামাসপর্যাবিধি'তে এই পূজার সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে। এই উপলক্ষ্যে পূজার প্রমাণস্বরূপ উক্ত গ্রন্থে পুরাণ ও তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।'] (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১১৪) এ বিষয়ে ড. শশীভূষণ দাশগুপ্তের মতটি হলোঃ "কাশীনাথ এই গ্রন্থে কালী পূজার পক্ষে যেভাবে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালী পূজা তখনও পর্যন্ত বাঙলাদেশে সুগৃহিত ছিল না।" নবদ্বীপের প্রথিতযশা তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে অনেকেই বাংলায় কালীমূর্তি ও কালীপূজার প্রবর্তক বলে মনে করেন। তাঁর পূর্বে কালী উপাসকগণ তাম্রটাটে ইষ্টদেবীর যন্ত্র এঁকে বা খোদাই করে কালীপূজা করতেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালীমূর্তি গড়িয়া পূজা করিতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার সাধক সমাজ অনেকদিন চলেন নাই, লোকে তাহাকে 'আগমবাগিশী' কান্ড বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীপূজাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এইসময় রামপ্রসাদ সেনও আগমবাগীশের পদ্ধতি অনুসারে কালীপূজা করতেন। কথিত আছে, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতকে তাঁর সকল প্রজাকে শাস্তির ভীতিপ্রদর্শন করে কালীপূজা করতে বাধ্য করেন। সেই থেকে নদিয়ায় কালীপূজা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্রও বাংলার জমিদারগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বহু অর্থব্যয় করে কালীপূজার আয়োজন করেন। পূজাকালে দেবী 'কালী'র ধ্যানমন্ত্রটি হলো:

ওঁ ক্রীং কাল্যই নমঃ,
ওঁ কপালিন্যই নমঃ,
ওঁ হ্রিং শ্রিং ক্রিং
পরমেশ্বরি কালিকে স্বাহা

এবং গায়ত্রী মন্ত্রটি হলো: 'কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি। তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।' 'কালীবীজ' মন্ত্রটি হলো 'বর্গাদ্যং বণহিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম'। এখানে 'বর্গাদ্য' শব্দের প্রতীক হচ্ছে 'ক', 'বণহি' শব্দের 'র', 'রতি' শব্দে 'ঈ' এবং তাতে বিন্দু যুক্ত। সব মিলিয়ে যে প্রতীকী শব্দটি তৈরি হলো তা হচ্ছে 'ক্রীং'। এভাবে 'ভুবনেশ্বরী বীজ' 'হ্রীং', 'লক্ষ্মীবীজ' 'শ্রীং'। যৌগিক বীজও আছে, যেমন 'তারাবীজ' 'হ্রীং স্ত্রীং হূ ফট' বা 'দুর্গাবীজ' 'ওঁ হ্রীং দূং দুর্গয়ৈ নমঃ'। তান্ত্রিক ক্রিয়ায় পূজাবিধিতে বিশেষ 'বীজমন্ত্র'ও আছে। কালিকার বীজ 'একাক্ষর', তারার বীজ 'ত্র্যক্ষর' এবং বজ্রবৈরেচনীর বীজ 'একাদশাক্ষর'। যোগিনীতন্ত্রে শিবের উক্তিতে এর প্রকাশ আছে। দেবীর এই তিন রূপের মধ্যে তারা ও বজ্রবৈরেচনী মূলতঃ বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবী। পূর্ণাভিষেকের সময় স্বয়ম্ভূ-কুসুমাদির প্রতি যে শুদ্ধিমন্ত্র উচ্চারিত হয় তা এরকম, 'প্লূং ম্লূং স্ক্লং শ্লং স্বাহা'। আবার 'ব্রহ্মশাপ বিমোচন' মন্ত্র, 'শুক্রশাপ বিমোচন' মন্ত্র বা 'কৃষ্ণশাপ বিমোচন' মন্ত্র মদ্যের প্রতি উৎসর্গিত হয়। এই সব শুদ্ধি মন্ত্র বা উৎসর্গ মন্ত্রে যেসব প্রতীক ব্যবহার করা হয় তা এরকম: 'খপুষ্প'মানে রজস্বলা স্ত্রীলোকের রজ, 'স্বয়ম্ভূ পুষ্প' বা 'স্বয়ম্ভূ কুসুম' মানে স্ত্রীলোকের প্রথম রজ (মনে পড়ে যেতে পারে-'....যত বিষয় মধু তুচ্ছ হইল, কামাদিকুসুম সকলে...: '-কমলাকান্ত, এখানে 'কামাদিকুসুম' শব্দবন্ধে 'স্ত্রীলোকের প্রথম রজপুষ্প'-এর উপমাটি যা এর তুল্যমূল্য), 'কুন্ডপুষ্প' মানে সধবা স্ত্রীলোকের রজ, 'গোলকপুষ্প' মানে বিধবা স্ত্রীলোকের রজ এবং 'বজ্রপুষ্প' মানে চন্ডালীর রজ (তন্ত্রসাধনায় এই 'চন্ডালী'নারীর বিশেষ কদর আছে)। এই সব 'পুষ্প' বামাচারী তন্ত্র সাধনার জরুরি উপকরণ। বাউলচর্যাতেও আমরা এজাতীয় পদ্ধতির প্রচলন দেখতে পাই। মন্ত্রজপকালীন যে পূজা, তার উপচার হচ্ছে, স্বয়ম্ভূকুসুম, লিঙ্গপুষ্প, কুন্ডগোলোদ্ভব পুষ্প, সংযোগামৃত পুষ্প, অম্বুবাচীর সময় কামাখ্যাপীঠে নিঃসৃত স্রোতে রঞ্জিত বস্ত্র, অপরাজিতাদি পুষ্প, পীঠের জল, শক্তিচক্রক্ষালিত জলবিন্দু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, নখি, কালাগুরু, গন্ধাষ্টক অর্থাৎ শ্বেতচন্দন, অগুরু, রক্তচন্দন, কর্পূর,শঠী,কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গাটিয়ালা, ধূপ, দীপ, জবা, বক, রক্তচন্দন, সিন্দূর, মৎস্য,মাংস ইত্যাদি, পিষ্টক, মধু, পায়স,ক্ষীর,শোধিত রক্ত, মহোপচার, কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, লবণ ও মধুর এই ষড়রসাশ্রিত নৈবেদ্য। এই উপচার দ্বারা মহাকাল কর্ত্তৃক উপসেবিত 'মহাকালী'র ও 'মহাকাল'-এর পূজা করতে হবে। এই পূজা শুরুর আগে পূর্ণগিরি, উড্ডীয়ন, জালন্ধর ও কামরূপ পীঠের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন আবশ্যক। এবম্বিধ নির্দেশের অর্থ এই চারটি পীঠস্থান তন্ত্রঐতিহ্যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পূর্ণগিরি নামক শক্তিপীঠটি উত্তরাখন্ডে কুমায়ুনে অবস্থিত। উড্ডীয়ন পশ্চিম ওড়িশায়,জালন্ধর মধ্য পঞ্জাবে আর কামরূপ গুয়াহাটির কাছে,অসমে। মহানির্বানতন্ত্রে দেবী কালীর রূপের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মযামলে'র আদ্যাস্তোত্রে আদ্যাদেবী কোন্ কোন্ দেশে কী কী রূপে পূজিতা হন তার বিবরণ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'কালিকা বঙ্গদেশে চ' অর্থাৎ বঙ্গদেশে দেবী কালিকারূপেই পূজিতা হন।

সপ্তম-অষ্টম শতকে রচিত 'দেবীপুরাণ'-এ জানা যায়, রাঢ়ী-বরেন্দ্র-কামরূপ-কামাখ্যা-ভোট্ট দেশে (তিব্বত) বামাচারী শাক্তমতে দেবী কালীর পুজো হতো। অথচ সপ্তম-অষ্টম শতকের আগেই বাংলাদেশে শক্তিপূজার প্রচলন হয়ে গেছিল। এর কিছু পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায় গুপ্তোত্তর যুগে উজ্জয়িনী কেন্দ্রিক মধ্য-ভারতের ইতিহাসে, যেখানে জয়দ্রথ-যামল গ্রন্থে ঈশান-কালী,রক্ষা-কালী,বীর্যকালী,প্রজ্ঞাকালী প্রভৃতি নানারূপ কালীর বর্ণনা আছে। এছাড়া ঘোরতারা, যোগিনীচক্র, চক্রেশ্বরী প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে আমাদের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শাক্ত আরাধনার উৎসভূমি শুধুমাত্র বাংলা নয়। তা গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর যুগে পশ্চিম ও মধ্য ভারত থেকে এসেছিলো যার প্রমাণ, আগম ও যামল গ্রন্থগুলি। তবে এটা স্বীকৃত ঐ আগম বা যামল গ্রন্থের ধ্যান ও অন্যান্য কল্পনার থেকেই বাংলা দেশে বিস্তৃত তন্ত্রসাহিত্য ও ধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিলো। পাল-চন্দ্র-কাম্বোজ লিপিমালা বা সেন-বর্মণ লিপিমালাতে গুহ্য তন্ত্র সাধনার স্পষ্ট উল্লেখ যদিও নেই কিন্তু তৎকালীন শাক্ত ধ্যান ধারণায় তান্ত্রিক ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। পালযুগের অসংখ্য শক্তিরূপা দেবীমূর্তি কিন্তু তন্ত্রোক্ত দেবী নয়,সেগুলি শৈবধর্মের আগম ও যামল অনুসারে কল্পিত শিবশক্তি মূর্তি। শৈব ধর্মের শক্তি ও শাক্তধর্মের দেবী পাল যুগ থেকেই পৃথক। বঙ্গদেশে পরবর্তীকালের কালীধারণা কিন্তু অতীতের বিচ্ছিন্ন দেবীকল্পনার বিবিধতাকে সমন্বিত করে এক 'মহাদেবী' রূপকল্পকে স্পষ্ট করে তোলার প্রচেষ্টায় প্রয়াসী হয়েছিলো। ব্রহ্মযামল মতে, কালী বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মহাকাল সংহিতা অনুসারে আবার কালী নববিধা। এই তালিকা থেকেই পাওয়া যায় কালকালী, কামকলাকালী, ধনদাকালী ও চণ্ডিকাকালীর নাম। তোড়ল তন্ত্র মতে কালী অষ্টধা বা অষ্টবিধ। বাংলায় পূজিতা অষ্টধা কালীর রূপ হলো যথাক্রমে দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, চামুন্ডাকালী, শ্মশানকালী ও শ্রীকালী।

'দক্ষিণাকালী' কালীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মূর্তি। ইনি প্রচলিত ভাষায় শ্যামাকালী নামে আখ্যাতা। দক্ষিণাকালী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভূজা এবং মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তাঁর বামকরযুগলে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড ও খড়্গ; দক্ষিণকরযুলে বর ও অভয় মুদ্রা। তাঁর গাত্রবর্ণ মহামেঘের ন্যায়; তিনি দিগম্বরী। তাঁর গলায় মুণ্ডমালার হার; কর্ণে দুই ভয়ানক শবরূপী কর্ণাবতংস; কটিদেশে নরহস্তের কটিবাস। তাঁর দন্ত ভয়ানক; তাঁর স্তনযুগল উন্নত; তিনি ত্রিনয়নী এবং মহাদেব শিবের বুকে দণ্ডায়মান। তাঁর দক্ষিণপদ শিবের বক্ষে স্থাপিত। তিনি মহাভীমা, হাস্যযুক্তা ও মুহুর্মুহু রক্তপানকারিনী। তান্ত্রিকেরা তাঁর নামের যে ব্যাখ্যা দেন তা নিম্নরূপ: দক্ষিণদিকের অধিপতি যম যে কালীর ভয়ে পলায়ন করেন, তাঁর নাম দক্ষিণাকালী। তাঁর পূজা করলে ত্রিবর্ণা তো বটেই সর্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ ফলও দক্ষিণাস্বরূপ পাওয়া যায়। 'সিদ্ধকালী' কালীর একটি অখ্যাত রূপ। গৃহস্থের বাড়িতে সিদ্ধকালীর পূজা হয় না; তিনি মূলত সিদ্ধ সাধকদের ধ্যান আরাধ্যা। কালীতন্ত্র-এ তাঁকে দ্বিভূজা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। অন্যত্র তিনি ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী। তাঁর মূর্তিটি নিম্নরূপ: দক্ষিণহস্তে ধৃত খড়্গের আঘাতে চন্দ্রমণ্ডল থেকে নিঃসৃত অমৃত রসে প্লাবিত হয়ে বামহস্তে ধৃত একটি কপালপাত্রে সেই অমৃত ধারণ করে তিনি পরমানন্দে পানরতা। তিনি সালংকারা। তাঁর বামপদ শিবের বুকে ও বামপদ শিবের উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত। 'গুহ্যকালী' বা আকালীর রূপ গৃহস্থের নিকট অপ্রকাশ্য। তিনি সাধকদের আরাধ্য। তাঁর রূপকল্প ভয়ংকর: গুহ্যকালীর গাত্রবর্ণ গাঢ় মেঘের ন্যায়; তিনি লোলজিহ্বা ও দ্বিভূজা; গলায় পঞ্চাশটি নরমুণ্ডের মালা; কটিতে ক্ষুদ্র কৃষ্ণবস্ত্র; স্কন্ধে নাগযজ্ঞোপবীত; মস্তকে জটা ও অর্ধচন্দ্র; কর্ণে শবদেহরূপী অলংকার; হাস্যযুক্তা, চতুর্দিকে নাগফণা দ্বারা বেষ্টিতা ও নাগাসনে উপবিষ্টা; বামকঙ্কণে তক্ষক সর্পরাজ ও দক্ষিণকঙ্কণে অনন্ত নাগরাজ; বামে বৎসরূপী শিব; তিনি নবরত্নভূষিতা; নারদাদিঋষিগণ শিবমোহিনী গুহ্যকালীর সেবা করেন; তিনি অট্টহাস্যকারিণী, মহাভীমা ও সাধকের অভিষ্ট ফলপ্রদায়িনী। 'গুহ্যকালী' নিয়মিত শবমাংস ভক্ষণে অভ্যস্তা। মুর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তবর্তী আকালীপুর গ্রামে মহারাজা নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত 'গুহ্যকালী'র মন্দিরের কথা জানা যায়। মহাকাল সংহিতা মতে, নববিধা কালীর মধ্যে 'গুহ্যকালী'ই সর্বপ্রধানা। তাঁর মন্ত্র বহু- প্রায় আঠারো প্রকারের।তন্ত্রসার গ্রন্থমতে, 'মহাকালী' পঞ্চবক্ত্রা ও পঞ্চদশনয়না। তবে শ্রীশ্রীচণ্ডী-তে তাঁকে আদ্যাশক্তি, দশবক্ত্রা, দশভূজা, দশপাদা ও ত্রিংশলোচনা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর দশ হাতে রয়েছে যথাক্রমে খড়্গ,চক্র,গদা,ধনুক,বাণ,পরিঘ,শূল,ভূসুণ্ডি,নরমুণ্ড ও শঙ্খ। ইনিও ভৈরবী; তবে 'গুহ্যকালী'র সঙ্গে এঁর

পার্থক্য রয়েছে। ইনি সাধনপর্বে ভক্তকে উৎকট ভীতি প্রদর্শন করলেও অন্তে তাঁকে রূপ, সৌভাগ্য, কান্তি ও শ্রী প্রদান করেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রথম চরিত্র শ্রী শ্রী মহাকালীর ধ্যানমন্ত্র এইরূপ: ওঁ খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘান শূলং ভুসূণ্ডিং শিরঃ| শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্ || নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাম্ | যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্ ||'ভদ্রকালী' নামের 'ভদ্র' শব্দের অর্থ 'কল্যাণ' এবং 'কাল' শব্দের অর্থ 'শেষ সময়'। অর্থাৎ যিনি মরণকালে জীবের মঙ্গলবিধান করেন, তিনিই 'ভদ্রকালী'। 'ভদ্রকালী' নামটি অবশ্য শাস্ত্রে দুর্গা ও সরস্বতী দেবীর অপর নাম রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কালিকাপুরাণ মতে, 'ভদ্রকালী'র গাত্রবর্ণ অতসীপুষ্পের, তাঁর হাতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ও পাশযুগ্ম। গ্রামবাংলায় অনেক স্থলে 'ভদ্রকালী'র বিগ্রহ নিষ্ঠাসহকারে পূজিত হয়। এই দেবীরও একাধিক মন্ত্র রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ চতুর্দশাক্ষর মন্ত্রটি হল - 'হৌঁ কালি মহাকালী কিলি কিলি ফট্ স্বাহা'। 'চামুণ্ডাকালী' বা 'চামুণ্ডা' ভক্ত ও সাধকদের কাছে কালীর একটি প্রসিদ্ধ রূপ। দেবীভাগবত পুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, 'চামুণ্ডা' চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই অসুর বধের নিমিত্ত দেবী দুর্গার ভ্রুকুটিকুটিল ললাট থেকে উৎপন্ন হন। তাঁর গাত্রবর্ণ নীল পদ্মের ন্যায়, হস্তে অস্ত্র, দণ্ড ও চন্দ্রহাস; পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম; অস্তিচর্মসার শরীর ও বিকট দাঁত। দুর্গাপূজায় মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে আয়োজিত সন্ধিপূজার সময় দেবী 'চামুণ্ডা'র পূজা হয়। পূজক অশুভ শত্রুবিনাশের জন্য শক্তি প্রার্থনা করে তাঁর পূজা করেন। অগ্নিপুরাণ-এ আট প্রকার 'চামুণ্ডা'র কথা বলা হয়েছে। তাঁর মন্ত্রও অনেক। বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণে বর্ণিত চামুণ্ডা দেবীর ধ্যানমন্ত্রটি এইরূপ - 'নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্বাহুসমন্বিতা । খট্বাঙ্গ চন্দ্রহাসঞ্চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে ।। বামে চর্ম্ম চ পাশঞ্চ ঊর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ। দধতী মুণ্ডমালাঞ্চ ব্যাঘ্রচর্মধরাম্বরা।। কৃশোদরী দীর্ঘদংষ্ট্রা অতিদীর্ঘাতিভীষণা। লোলজিহ্বা নিমগ্নারক্তনয়নারাবভীষণা।। কবন্ধবাহনাসীনা বিস্তারা শ্রবণাননা। এষা কালী সমাখ্যাতা চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে।।' 'শ্মশানকালী' পূজা সাধারণত শ্মশানঘাটে হয়ে থাকে। এই দেবীকে 'শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী' মনে করা হয়। তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচিত বৃহৎ তন্ত্রসার অনুসারে এই দেবীর ধ্যানসম্মত মূর্তিটি নিম্নরূপঃ শ্মশানকালী দেবীর গায়ের রং কাজলের মতো কালো। তিনি সর্বদা বাস করেন। তাঁর চোখদুটি রক্তপিঙ্গল বর্ণের। চুলগুলি আলুলায়িত, দেহটি শুকনো ও ভয়ংকর, বাঁ-হাতে মদ ও মাংসে ভরা পানপাত্র, ডান হাতে সদ্য কাটা মানুষের মাথা। দেবী হাস্যমুখে মাংস খাচ্ছেন। তাঁর গায়ে নানারকম অলংকার থাকলেও, তিনি উলঙ্গ এবং মদ্যপান করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। 'শ্মশানকালী'র আরেকটি রূপে তাঁর বাঁ-পাটি শিবের বুকে স্থাপিত এবং গলে মুন্ডমালা ও ডান হাতে ধরা খড়্গ। এই রূপটিও ভয়ংকর। মাতৃমূর্তির এ হেন রূপ দেখে দ্বিজ রামপ্রসাদও তাঁর গানের মধ্যে প্রশ্ন করে বসেছিলেন, 'বসন পর মা' অথবা 'শিব কেন তোর পদতলে, মুণ্ড মালা কেন গলে'। তন্ত্রসাধকেরা মনে করেন, শ্মশানে 'শ্মশানকালী'র পূজা করলে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রী সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বরে 'শ্মশানকালী'র পূজা করেছিলেন। কাপালিকরা শবসাধনার সময় কালীর 'শ্মশানকালী' রূপটির ধ্যান করতেন। সেকালের ডাকাতেরা ডাকাতি করতে যাবার আগে শ্মশানঘাটে নরবলি দিয়ে 'শ্মশানকালী'র পূজা করতেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাচীন শ্মশানঘাটে এখনও 'শ্মশানকালী'র পূজা হয়। তবে গৃহস্থবাড়িতে বা পাড়ায় সর্বজনীনভাবে 'শ্মশানকালী'র পূজা হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন, 'শ্মশানকালী'র ছবিও গৃহস্থের বাড়িতে রাখা উচিত নয়। গুণ ও কর্ম অনুসারে 'শ্রীকালী' কালীর আরেক রূপ। অনেকের মতে এই রূপে তিনি দারুক নামক অসুর নাশ করেন। ইনি মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করে তাঁর কণ্ঠের বিষে কৃষ্ণবর্ণা হয়েছেন। শিবের ন্যায় ইনিও ত্রিশূলধারিনী ও সর্পযুক্তা।

স্বামী সারদানন্দের মতে রামকৃষ্ণ পরমহংস ১২৬২ থেকে ১২৭২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত নানা মতে অধ্যাত্মসাধনা করেন। এর মধ্যে ১২৬৬ থেকে ১২৬৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চার বছর কাল তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশে ও তাঁর নির্দেশে তন্ত্র-সাধনা করেন। দক্ষিণেশ্বরে আসার আগে কামারপুকুরের শ্মশানে তিনি প্রেতসিদ্ধি জাতীয় অলৌকিক পদ্ধতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তবে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে তাঁর গুরু হিসাবে যে সাধকের কথা জানতে পারি,সেই রামকৃষ্ণদেব ছিলেন এ দেশের চিরকালীন ধর্মীয় সমন্বয়বাদের প্রধান প্রবক্তা ও চালিকা শক্তি। তন্ত্রসাধক

হিসেবে তাঁর পরিচয়,রামপ্রসাদের মতো-ই এই ধর্মসমন্বয়কারী প্রবর্তক অথবা সংস্কারকের প্রবল ভাবমূর্তির সামনে একেবারেই ম্লান হয়ে গেছে।

আদ্যাশক্তি মহামায়া ও শক্তিসাধনা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের মতটি হলো "...তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণীকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়
করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিসই কেবল দেখা যায় -- সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না।" তাই পুরাণে আছে --চন্ডীতে আছে-- মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে "শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে, -- অবিদ্যা --মুগ্ধ করে। অবিদ্যা -- যা থেকে কামিনী- কাঞ্চন -- মুগ্ধ করে। বিদ্যা -- যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম -- ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়। তাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি।"(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত) রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'জপে ঈশ্বর লাভ হয়।' মহামুনি পতঞ্জলী তার যোগসূত্রে বলেছেন 'তজ্জপস্তদর্থভা বনম্'। ওঁকার মন্ত্রের জপ করতে হবে, তার অর্থ ভাবনা করতে হবে। খন্ড মন্ত্রের জপ যারা করেন, তাদেরও পরিশেষে অখন্ড মন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়। জপ মনে মনে হোক বা উচ্চারিত হক - তা ভাবের জগতে ও আকাশে তরঙ্গ তোলে, অভীষ্টদেবের পায়ে তা নিবেদিত হয়ই। যদি তা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাপূর্ণ হয়, তবে তা কখনই ব্যর্থ হয় না। রেডিও - তরঙ্গ তো সর্বদাই আকাশে বাতাশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কেবলমাত্র বিশেষ transmission বা প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যই তাকে প্রবাহমান করা যায় এবং বিশেষ receptor বা গ্রাহকযন্ত্রেই তা ইন্দ্রিয়গোচর হয়। এ সকল উক্তি থেকেও শক্তিতত্ত্বের তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ পরিক্রমাকে গড়ে উঠতে দেখা যায়।

স্বামীজীর মতে আদ্যা শক্তির অন্যতমা জীবন্ত প্রতিকৃতি হলো নারী। স্বামীজীর মতেঃ-'হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।' একসময় তিনি এও বলেওছিলেন যে, ভারতের আর একটি মহাপাপ হলো নারীজাতিকে অবহেলা করা। তিনি বলতেন, পাখী যেমন একটি ডানায় ভর করে উড়তে পারে না, তেমনি শুধুমাত্র পুরুষদের উপর নির্ভর করে দেশ চলতে পারে না। জাতির উন্নতির জন্য নারীপ্রগতি একান্ত আবশ্যক। বাল্যবিবাহেরও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি চাইতেনঃ মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা নিজেরাই সমাধান করবে। পুরুষরা যেন সে ব্যাপারে নাক না গলায়।

পুরুষরা শুধু শিক্ষার সুযোগ দিয়ে মেয়েদের প্রাথমিকভাবে কিছুটা সাহায্য করতে পারে, এইপর্যন্ত। পুরুষদের চেয়ে নারীদের ওপরে স্বামীজীর বেশী ভরসা ছিল। তিনি বলতেনঃ পাঁচশো পুরুষের

সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে যদি পঞ্চাশ বছর লাগে, তাহলে পাঁচশো নারী মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা করে ফেলবে। নারীশক্তির এই জাগরণের স্বপ্ন স্বামিজীর মনে উদ্বোধিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে কল্যাণময়ী শ্যামামূর্তি প্রদর্শনেই যা স্বয়ং নারীশক্তিসম্ভূতা। 'মৃত্যুরূপা কালী' হল দেবী কালীকে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একটি বিখ্যাত দীর্ঘকবিতা। ভগিনী নিবেদিতা মাতৃরূপা কালী নামে একটি কালী-বিষয়ক বইও রচনা করেছিলেন। ভারতের শক্তিপূজা সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ বলেছেন: অন্য দেশে মা শত হস্তে ধন ধান্য ঢালিয়া দিতেছেন দেখিয়া ঈর্শায় তোমার অন্তঃস্থল জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের হৃষ্ট-পুষ্ট সন্তান - সকলের প্রফুল্ল মুখ - কমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদন বিরহিত, রোগে জর্জরিত তোমার সন্তান দের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্যের পদাঘাত - পীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্ট কে শত বার ধিক্কার দিতে থাক। কিন্তু দোষ কাহার? দেখিতেছ না তাহারা অজ্ঞান সমরে সামর্থ প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে। আর তুমি সহস্র বছরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব ও নিশ্চিন্ত আছ। উহারা বিদ্যা রূপিণী শক্তি পুজায় অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে।

অজস্র হৃদয় রুধির ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য আত্ম বলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে। আর তুমি অবিদ্যা সেবায় যথা সর্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ সুখ নিয়া বসিয়া আছ, জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? মাতৃশক্তি ভাবনার ক্ষেত্রে এ উদ্ধৃতি এক অনন্য নজির।

দেশমাতৃকা ও জগন্মাতৃকা একাকার হয়ে গিয়েছিলেন দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের উপলব্ধিতেও। নেতাজী ছিলেন একনিষ্ঠ কালীভক্ত। শক্তিসাধনাই তাঁকে অন্তরে করে তুলেছিল প্রকৃত শক্তিমান, বীর্যবান ও বীর দেশপ্রেমিক। তাঁর অন্তঃচৈতন্য ও অনুপ্রেরণার শক্তি ছিল "পরাপ্পরানাং পরমা জগজ্জননী সুখপ্রদায়িনী নৃমুন্ডমালিনী।" নেতাজীর জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতি চিরন্তন ও বিশ্ববন্দিত। দেশমাতারূপে মহামায়া বরাভয়প্রদা মহাকালিকার আরাধনা সেই প্রেরণারই জীবন্ত প্রতিমা। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে শক্তিসাধনার সম্পর্ক অতি সুপ্রাচীন। নবযুগে দেশমাতৃকাকে দেবীত্বে আরোপিত করে তাঁর প্রানমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হওয়াই ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের জীবনসাধনা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীতেও এর পরিচয় মেলে। দেশজননী, মন্দিরবাসিনী ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী মা এই তিন রূপেই মেলে আধুনিক শক্তিতত্ত্বের স্বরূপ সন্ধান। ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের আগের দিন ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বসুর মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর থেকে ভবতারিণী মায়ের নির্মাল্য ও প্রসাদ আনিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর নেতাজী সিঙ্গাপুরে যে দিন আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর দায়িত্বভার নেন সে দিন ছিল কালীপূজার দিন। এমনকি রণক্ষেত্র থেকেও তিনি অনেক গোপনীয় গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখেন শ্যামাপূজার ঘোর অমারজনীতে। গভীর রাতেও নেতাজী বারবার ছুটে যেতেন সিঙ্গাপুর অথবা রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশনে। সামরিক পরিচ্ছদ ছেড়ে পরতেন পট্টবস্ত্র। কপালে সিন্দুরতিলক। দীর্ঘক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকতেন। মাতৃতত্ত্ব নিয়ে প্রায়শই আলোচনা হতো মিশনের সাধু, সন্ত ও ভক্তদের সঙ্গে। বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বলা "তোরা জন্ম হতেই মায়ের পায়ে বলিপ্রদত্ত" মাতৃমন্ত্রের এই নবঋক ধ্বনিতে একদিন শত শত বিপ্লবীর প্রানে-মনে জ্বলে উঠেছিল দেশপ্রেমের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। স্বামীজির কবিতা "নাচুক তাহাতে শ্যামা" স্বদেশভক্তদের কাছে ছিল মাতৃকৃপা-লাভের জন্য প্রভূত প্রেরণার উৎস। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই কবিতার শেষ চার ছত্র প্রায়ই আবৃত্তি করতেন, যা হলো-

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপ্ন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমী চিতা মাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা,
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা"

এ থেকেই বোঝা যায় নেতাজীর জীবন ও লেখনীতে শক্তিসাধনারও কত স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর রচনার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন –"ভয় জয় করার উপায় শক্তিসাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোনও রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিরূপে প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে।" তাঁর এ উক্তি থেকেই বোঝা যায় মানুষের বীরত্ব ও মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য শক্তিসাধনা অপরিহার্য আর এই শক্তিসাধনা তাঁর বীর হৃদয়ে কতখানি স্থান জুড়ে ছিল। ১৯৩৫ সালে নতুন দিল্লীতে কালীবাড়ী মন্দির কমিটি গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এই কমিটির প্রথম সভাপতি। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম মন্দির ভবনটি উদ্বোধন করেছিলেন।

প্রাচীন কাল থেকেই কলকাতার কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কালীপূজার বিধি চলে আসছে। কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত কালীমন্দির তথা কালীঘাট মন্দিরটি হলো একটি সতীপীঠ। এছাড়া আদ্যাপীঠ, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি, লালনার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ময়দা কালীবাড়ি, উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরের রামপ্রসাদী কালী মন্দির ইত্যাদি তো আছেই! বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত রমনা কালীমন্দিরটিও এককালে খুবই প্রাচীন কালীমন্দির নামে পরিগণিত ছিল। ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লির নতুন দিল্লি কালীবাড়ি যে একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালীমন্দির সেকথা পূর্বেই বলেছি। খুব সম্প্রতি

ভারতাগত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সর্বজাতি ও সর্বধর্মের ঐক্যস্থল হিসাবে ভারতের প্রশংসা করেন। এ বিষয়ে রয়টারে প্রকাশিত সংবাদটির তাৎপর্য এরূপঃ US President Barack Obama greeted Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists across the globe on the occasion of Diwali, saying 'The flame of the diya, or lamp reminds us that light will ultimately triumph over darkness'. (Reuters) বলাবাহুল্য ওবামার এই উক্তির মধ্যে দিয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়া নানাধর্ম ও নানাজাতির ভারতীয়দের প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে তেমনই সেই সর্বমিলনের উৎস দীপাবলী উৎসবকেও প্রণতি জানানো হয়েছে। ঋক্ বেদেও বলা হয়:

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথেরও বড় প্রিয় ছিল। মনে রাখতে হবে, দেওয়ালী বা বা দীপাবলী উৎসব শুরু হয় কালী পূজার অব্যবহিত পর থেকেই। শক্তিময়ী তারা তখন আর রুদ্রাণী নন, নন শ্মশানচারিণী, শিবাকূল সঙ্গিণী, ভীতিপ্রদায়িনী বরং তিনি বরাভয়রূপিনী জগজ্জননী, অন্ধকার থেকে যে মা হাত ধরে আমাদের আলোর পথে নিয়ে আসেন। তাই তো কালীপূজার সাথে দীপাবলীর এত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তাই তো মাতৃ পূজার লগ্নে ঢাকের নিনাদ আর হস্তধৃত উত্তোলিত প্রদীপের আলোয় ঘরে ঘরে শুরু হয়ে যায় দেওয়ালীর শুভ প্রস্তুতি। আর সেই অগণ্য প্রদীপশিখা সর্ব অন্ধকারগ্রাসী গঙ্গার বুকে আরও একবার প্রসারিত আলোকমালার বিস্তার ছড়িয়ে জেগে থাকে দেবী বিসর্জনের পরও।

প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র :

বাংলা

১. ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ
২. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয় কুমার দত্ত
৩. শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১
৪. বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫. প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য
৬. কালীতন্ত্রম, জগন্নাথ দাস (সং)
৭. বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদি পর্ব, নীহার রঞ্জন রায়
৮. উপনিষদ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
৯. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ
১০. কালিকা পুরাণ
১১. হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় খণ্ড, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৭
১২. প্রাচীন ভারত, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
১৩. বিষ্ণুপুরাণ, রামসেবক বিদ্যারত্ন (অনুবাদ)
১৪. ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা, লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য

১৪. বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, শরচ্চন্দ্র দাস (অনুবাদ)
১৫. হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৬. মহানির্ব্বাণতন্ত্র, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
১৭. তন্ত্রকল্পদ্রুম, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদ)
১৮. 'শ্রী শ্রী কালীপূজা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙালীর পূজাপার্বণ, অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,১৩৫৬
১৯. যোগিণীতন্ত্রমঃ, শঙ্করাচার্য্য কাপালিক (অনুবাদ)
২০. প্রসাদপ্রসঙ্গ (রামপ্রসাদ সেনের জীবনী), দয়ালচন্দ্র ঘোষ
২১. দক্ষিণাকালীর ধ্যান, স্তবকবচমালা ও ধ্যানমালা, পণ্ডিত বামদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত, অক্ষয় লাইব্রেরি, কলকাতা
২২. গুহ্যকালীর ধ্যান, স্তবকবচমালা ও ধ্যানমালা, পণ্ডিত বামদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত, অক্ষয় লাইব্রেরি, কলকাতা
২৩. বৃহৎ তন্ত্রসার, প্রথম খণ্ড, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯৭
২৪.কোন কালী কেমন, কার পুজোয় কী ফল; সঞ্জয় ভুঁইয়া; বর্তমান রবিবার, ১১ অক্টোবর, ২০০৯
২৫. শ্রীশ্রীদুর্গা: তত্ত্বে ও কাহিনীতে, স্বামী অচ্যুতানন্দ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ২০০৭

ইংরাজী

1. Medieval India: The Study of a Civilisation: Irfan Habib
2. History of Medieval India: Satish Chandra
3. The History of Early India: Romila Thapar
4. India: Historical Beginnings and the concept of the Aryan: Romila Thapar
5. Tantric visions of the divine feminine: the ten mahaviyas, David R. Kinsley
6. Mother of my heart, daughter of my dreams: Kali and Uma in the Devotional Poetry of Bengal, Elizabeth McDermott
7. Offering flowers, feeding skull: popular Goddess worship in West Bengal, June McDaniel
8. Kali: The Black Godess of Dakshineswar, Elizabeth Usha Harding, Nicolas Hays, 1993
9. Sri Ramakrishna: The Spiritual Glow, Kamalpada Hati, P.K. Pramanik, Orient Book Co., 1985
10. Sri Ramakrishna (The Great Master), Swami Saradananda, Ramakrishna Math, 1952
11. Kali Puja, Swami Satyananda Saraswati
12. Kali: The Feminine Force, Ajit Mookerjee
13. Grace and Mercy in Her Wild Hair: Selected Poems to the Mother Goddess , Ramprasad Sen
14. Devi Mahatmyam, Swami Jagadiswarananda, Ramakrishna Math, 1953
15. Shakti and Shâkta, Arthur Avalon (Sir John Woodroffe), Oxford Press/Ganesha & Co., 1918

16. Mother of the Universe: Visions of the Goddess and Tantric Hymns of Enlightenment, Lex Hixon
17. Tantra in Practice, David Gordon White, Princeton Press, 2000
18. Tantra (The Path of Ecstasy), Georg Feuerstein, Shambhala, 1998
19. The Art of Tantra, Philip Rawson, Thames & Hudson, 1973
20. Seeking Mahadevi: Constructing the Identities of the Hindu Great Goddess, Edited by Tracy Pintchman
21. In Praise of The Goddess: The Devimahatmyam and Its Meaning , Devadatta Kali
22. Encountering Kali (In the margins, at the center, in the west), Rachel Fell McDermott, Berkeley: University of California Press, 2003
23. Hindu Gods & Goddesses, Swami Harshananda, Ramakrishna Math, 1981
24. Encountering The Goddess: A Translation of the Devi-Mahatmya and a Study of Its Interpretation, Thomas B. Coburn
25. In the Beginning is Desire: Tracing Kali's Footprints in Indian Literature, Neela Bhattacharya Saxena